অষ্টম অধ্যায় । লোকসঙ্গীত

(ক) পালাগান-পৌরাণিক-বেণাকুশান, বিষহরা

কুশান গান লবকুশকেন্দ্রিক । লবকুশই এই গানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মূল গায়েনের হাতে থাকে বেণা । এই গায়েনকে বলা হয় গীদাল । তিনি বেহালা জাতীয় একপ্রকার দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বেণা বাজিয়ে গান পরিচালনা করেন বলে এই গানের নাম বেণাকুশান ও বলা হয়। তাছাড়া খোল, করতাল এবং বাঁশীও থাকে । সঙ্গে থাকে দোহার বা 'দোয়ারী' এবং অন্যান্য গায়কবৃন্দ । নাচ-এর এবং প্রয়োজনবোধে অভিনয় করার জন্য কমবয়সী ছেলেদের মেয়ের পোষাক পরানো হয়, এদের বলা হয় ছোকরা । রাত জেগে এই পালাগান গাওয়া হয়। কুশান গান প্রসঙ্গে একটি লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় —

মূল গীদাল মোহনের ব্যাটা নকরু তার হইল নাম ।
ডরা সভা নাশিল ভাইরে গানে না আইসে ফাম (স্মরণ) ।
রামায়ণের বই দেখিয়া শিখছে কুশান গান,
ঘরে ঘরে যত চ্যাংড়াক মাগিয়া বেড়ায় ধান ।
যেই চ্যাংড়ার বাড়ী বুলি যায় সেই চ্যাংড়ায় কয়
শিয়ানোক না জিজ্ঞাস করিলে যাওয়ায় হবার নয়।[১]

অর্থাৎ কুশান গান রামায়ণ বই থেকেই মুখ্যত: তার উপাদান সংগ্রহ করে এবং গানের দলের কর্মকর্তাদের 'ছোকরা' সাজানোর জন্য চ্যাংড়া সংগ্রহ করতে তাদের বাড়ীতে গিয়ে পারিশ্রমিক হিসেবে ধান দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । কারণ চ্যাংড়া তো নাবালোক, সেজন্য তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সে কিভাবে কুশান গানের দলে গান গাইতে ও নাচতে যেতে পারে ।

এই কুশান গানের নাচ ও গানের আঙ্গিক ও রীতি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলা ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর দলীয় গানেও ব্যবহৃত হয় । যেমন — নয়ানপরী, সত্যপীর, ময়নামতী, মনাইযাত্রা, ভাসান-যাত্রা প্রভৃতি । তবে 'দোতোরা' বা দোতারার ব্যবহার প্রতিটি পালাগানেই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । কুশান গান যদিও রামায়ণের লব-কুশ কেন্দ্রিক ঘটনাকে নিয়েই তথাপি

এই গানে মহাভারত ও পুরাণ-এর নানা ঘটনা থেকেও কাহিনী বেছে নিয়েও গান করা হয়ে থাকে। এই কুশান গানে সোনাপীর, মাণিকপীর আদি পীর সকলের মহিমার আখ্যানমূলক কথা গোয়ালপাড়া জেলায় গাওয়া হয়ে থাকে। গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় কুশান গানে ব্যবহৃত 'রাজা হরিশ্চন্দ্রর পালা' গানের একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ তুলে ধরা হোল : –

হরিতের পুত্র হরি বীজ নাম ধরে।
বসতি করিল রাজা অযোধ্যা নগরে ॥
একদিন সভা করি বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথমা যুবতী ॥
নাচিতে নাচিতে কন্যার বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিল কন্যা পরতাল ভঙ্গ ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিলা পঞ্চকন্যার ওপর ॥
এত শুনি কন্যাসব করিলা গমন।
বিশ্বামিত্র তপোবনে দিলা দরশন ॥
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেলা তপোবন।
ডাল ভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়ন ॥
তারপরে যখন কন্যা ডালে ভর দিল।
তেক্ষণে লতার বন্ধন হস্তেতে লাগিল ॥
মৃগ না পাইয়া হরিশ্চন্দ্র বসে তরুতলে।
কন্যা সব মুখে ডাকে হরিশ্চন্দ্র বলে ॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেলা তপোবনে।
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়া গেল পঞ্চজনে ॥ [২]

বিষহরা বা পদ্মাপুরাণ

বিষহরি ঠাকুরাণীর উল্লেখ সর্বপ্রথম আমরা পাই মহারাজা বিশ্বসিংহের (১৪৯৬-১৫৩৩ খৃঃ) রাজদরবারের কবি মানকর রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। হরপার্ব্বতীর বিবাহখণ্ডের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছেন : –

কামতাইর রাজা বন্দো রাজা জন্দেশুর
একশত মহিষি বন্দো আঠারো কুমর ।

প্রখ্যাত অসমীয়া পণ্ডিতদ্বয় শ্রীবিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া ও সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে, " যান করে উল্লেখ করা জন্দেশুর এবং কামতাইর রাজা " আমাদের বিশ্বসিংহ সম্ভবত কোচরাজা বিশ্বসিংহ । কেননা বিশ্বসিংহকে কামতার রাজা বলে কবি দুর্গাবরও উল্লেখ করেছেন । বিশ্বসিংহ প্রথমে শ্রীকোনাতে (চিকনা - গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত) রাজধানী নির্মাণ করান । "[৩]

এই দেবীকে কাণি বিষহরিও বলা হয়ে থাকে । শ্রাবণ মাসে এই দেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলায় দেখা যায় । এবং এই বিষহরি-র পূজা উপলক্ষ্যে যে গান গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় বিষহরির গান । এই গানের দলেও মূল গায়েন ও দোহার থাকে ।

এই পালাগানের কতগুলি বিশিষ্টতা রয়েছে । যেমন মূল বা প্রধান গীদালের ডান হাতে সারাক্ষণ একটি কালো রঙের 'চণ্ডোর' অর্থাৎ চামর থাকে । এছাড়া থাকে দু'জন খোলবাদক । দু'জন খাঁশীবাদক এবং দু'জন মুখা বাঁশীবাদক । এই মুখাবাঁশীর বৈশিষ্ট্য হোল পালাগানটির শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানাভাবে অনেকটা সাপ খেলানো সুরের ভঙ্গীতে বাজিয়ে চলা হয় । এইজন্য গোয়ালপাড়া জেলায় এই গানকে অনেকে বাঁশীপুরাণও বলে থাকেন ।

এতদঞ্চলে এই দেবীর অপর নাম মারাই বা মারৈ । মরক বা মারী শব্দ থেকে সম্ভবত: মারৈ শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ ভারতেও মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'মারি অম্মা' বা 'মারম্মা' ।[৪] এই মারাই ঠাকুরাণীকে যে গৃহস্থ পূজো দেন তাকে 'মারেয়া' বলা হয় । অবশ্য বর্তমানে যেকোন সম্পন্ন গৃহস্থকেই যিনি যে কোন গৃহদেবতা বা লৌকিক দেবতার পূজা করুন না কেন তাকেই 'মারেয়া' বলা হয়ে থাকে ।

এবারে বিষহরির পালাগান বিষয়ক যে একখানি প্রাচীন পুঁথি তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলুসি গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ অধিকারীর কাছ থেকে পেয়েছি তার অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । মূল পুঁথিটির অনুলিপি পরিশিষ্ট ... অংশে হুবহু দেয়া হয়েছে । পুঁথিতে একাধিকস্থানে সুকবি নারায়ণ দেবের নাম লেখা আছে ।

পুঁথির বয়স অনুমান সাপেক্ষ । তবে কিছু পৃষ্ঠায় পেট কেটে দেয়া 'ব' 'র' দেখে ণ এবং কাগজ ও কালির ব্যবহার দেখে মনে হয় পুঁথিটির বয়স শতাধিক বৎসরের মত হবে ।

বাসরঘরে পদ্মাপ্রেরীতি সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যুর পর বেউলাসুন্দরীর দেবসভায় গমনের পর শিবের নিকট মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য কাতরকণ্ঠে বর প্রার্থনা 'জিয়া দেহ প্রাণনাথ চাই এহি বর' পাঞ্চি উক্ত পুঁথিতে । কিছু অংশের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য –

"কান্দে কান্দে সুন্দরী কন্যা দেবোতার আগে
কি কথা কব গোসাঞি বর দুঃখ নাগে ॥
তোমারো ঝিউ পদ্মাপতি নিদারুণ হিয়া
বিভারাত্রিতে স্বামী খাইল সর্প দিয়া ॥
বাসি রাত্রি নাহি আও বিভাত বাসোড়ে
তিরি হৈয়া মনসা পুরুসো বধ করে ॥
আরো সঙ্গে বাদ কিছু করিতে না পারে
সুন্দরী দেখিয়া পদ্মা মোর স্বামীক মারে ॥"

দেবসভায় পদ্মার অপমানের পর ক্রন্দনরতা পদ্মার মনোভাব উত্তরবঙ্গের প্রাকৃত নারীর পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহের সামাজিক চিত্রখানিকেই যেন তুলে ধরে –

"একে তো দারুন সাধু নাদে ফুলপানি
নিরন্তরে গালি পারে বেং খাই কাণি ॥
জে জন পোড়ে মোক নগর ভিতরে
মস্তকে মুরাইয়া তাক নগরের বাহির করে ॥
আরো গালি পারে মোকো ঢেমেনা ভাতারি"

অতঃপর শিব ও অপরাপর দেবগণের অনুরোধ ক্রমে পদ্মা বেহুলার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে

'সুনিঞা বেপুলা হৈল আনন্দীত মন ।
সন্তুষ্টি সহিতে বন্দে পদ্মার চরণ ॥"

তখন "দেবতা সভাত বানি নমস্কার করে
আজ্ঞা কর মামাক জাইতে চাই ঘরে ॥
দেবোগণ বোলে বানি জাহো নিজ ঘর -
পদ্মার পূজা করে যেন চান্দ সদাগর ॥

এইভাবে পুথিতে উল্লিখিত পালাগানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উৎসবকেন্দ্রিক পালাগান - হুদুমদেও, কাতিপূজা, সোনারায়, মদনকাম ও সত্যপীর।

হুদুমদেও পূজার পদ্ধতি ও গান সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ে লৌকিকদেবতা ও তাহাদের বিশিষ্ট পূজাবিধি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি বলে এই অধ্যায়ে আর তার পুনরুল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম। এখানে শুধু পালাগানের অংশবিশেষের উদাহরণ দেয়া হোল : —

জাগরে জাগরে হুদুম আজিকার রাতি,
গৃহস্থীয়া করে পূজা, দিয়া ধূপ চাইলন বাতি।
আকাশতে কর পূজা আকাশ কাওনী।
পাতালতে কর পূজা এককাল নাগানী।
কালা মেঘ ধওলা মেঘ ডাকিয়া আনো ঝরি
আন্ধার করিয়া দেওয়া আইসে দাবারি।
আন্ধার করিয়া দেওয়ার ঝরি আয়রে,
কালা মেঘে দেওয়ার ঝরি আয়রে।
আইলো আইলোরে হুদুম দেশোত আইলোরে।
আইলোরে হুদুমের মাও, চাইলন বাতি বরিয়া নেও।
আজি হুদুমের শুভদিন, কালাবাড়ীত পারে নিন।
কালাবাড়ীত সুরসুরায়, চাইলন ধরি পরমরায়।
হুদুমের মাও বন্দী হইল জোর মারোয়ার তনেরে,
হুদুমের ঘর সাত ভাই, করে তারো হাল কামাই।
হুদুমের ঘর সাত ভাই, কারো খেতোত পানি নাই।
আছে পানি পাথোতে, ঢালিয়া দিব জমিতে।[৫]

বস্তুত হুদুমদেও পূজা ও গান অনাবৃষ্টির সময় প্রকৃতপক্ষে অঞ্চলের নারীরা গভীর রাত্রে নানাবস্থায় বৃষ্টির দেবতাকে নানাভাবে আবাহন করেন সেই গানই হুদুমদেও এর গান। তবে এই গানের মাঝে মাঝে অশ্লীল গানও গাওয়া হয়ে থাকে।

কাতিপূজার গান

কাতিপূজার পদ্ধতি ও গান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ের লৌকিক দেবতা ও তাহাদের বিশিষ্ট পূজাবিধি পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। এবং কাতিপূজায় সারারাত ধরে যে সমস্ত নাচিয়ে ছেল্লো নাচের সাথে সাথে গানও করে সেই সমস্ত গান-গুলি পরিশিষ্ট ...ক... কাতিপূজার গান অংশে দেয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে এই গানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে রাজবংশী ব্যতীত বড়ুয়া কায়স্থ, নাথ সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত সমাজে ও এই পূজার ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। বিবাহিতা রমনীরা পুত্রসন্তান কামনায় কাতিঠাকুরের কাছে মানত করে। তদনুযায়ী কার্তিক সংক্রান্তির রাত্রে এই পূজা ও পূজার সাথে সাথে নাচ ও গান-এর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

সোনারায়ের গান

দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়কে বাদ দিয়ে যেমন দক্ষিণ বঙ্গের লোকসংস্কৃতির চিন্তা করা যায় না তেমনি উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চিন্তায় সোনারায় ঠাকুরকে বাদ দিতে যাওয়াটাও তদনুরূপ কাজ হবে বলে মনে হয়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এই লোকদেবতার পূজা ও গানের প্রচলন আছে। ঐতিহাসিক খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা মনে করেন যে উত্তরবঙ্গের সোনারায় ও রূপারায় দুজনেই ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা লোকদেবতার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার মতে সোনা রায় ও রূপা রায় দুজনেই ধর্মপ্রচারক এবং গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে[৬]- ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের পাট বা গড় এখনও প্রদর্শিত হয়ে আসছে। সোনারায়কে বাঘের দেবতারূপেই দেখা যায় হয়। পৌষ মাসে গ্রামের কৃষকের ছেলেরা গৃহস্থের বাড়ীর তুলসীমঞ্চের সামনে এসে গানাগানের বংশবিশেষ গেয়ে ধানচাল সংগ্রহ করেও পরে সংক্রান্তির দিন সেই সংগৃহীত চালের দ্বারা সোনারায় ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করে। গানে আছে —

'বাঘ নাচিল রে চিতিয়া পাখেরা,
ভোর বিহানে নাচিল বাঘ মানুষ কামেরা ।
পাখী উরিয়া যায় তার ভোর পায়ে নেপুর,
বাঁশী বাজায় গান করে সোনারায় ঠাকুর ।

এই গানে গৃহস্থকে বর দানের নির্দেশ আছে --

"সত্য ঠাকুর সোনারায় গাইরহস্তোক (গৃহস্থকে) দে তুই বর,
ধনে বংশে বাড়ুক গীরি (গৃহস্থ) চন্দ্র দিবাকর ।"

সোনারায়ের যাপনকালে দক্ষিণা দিতে কোন কোন্ জিনিষের প্রয়োজন হয় — তারও উল্লেখ রয়েছে — 'সোনারায়ক দক্ষিণা দিতে লাগে পূর্ণকুলা ধান,
তারে উপরা লাগে আরো ভোর পুয়াপান ।'

এবং এই দেবতাকে অবহেলা করার পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করে গাওয়া হয় —

সোনারায়ক দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা,
তার ভাতারোক নাপান পাইয় সুই পরু চড়েবার বেলা ।
সোনারায়ক দক্ষিণা দিতে যদি বুড়ী ব্যাটি কৌতে,
রাইত পোহাইলে নিয়া যাইবে তাক সোনারায়ের ভূত ।

সোনারায়ের গানে মেচ বা বোড়োদের ও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় তবে তাদের দেবতার নাম 'মৌদারাজা অরণয় নতা' । এ প্রসঙ্গে ড: অজয় কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'সোনারায়ের গান' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । সোনারায়ের গানে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মহাজনকৃত কৃত্রিম বৈষম্যের কথা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের দুরবস্থার কথাও প্রকাশ পেয়েছে : —

মহাজনে ধান কিনিয়া গুদাম ভর্তি করে,
পেটের দায়োত গরীব মানুষ মরুক বিত্রনি কল্লে ।
তবুও না বাঁচে প্রাণ মহাচিন্তাত পরে,
উপায় না পায় শেষত মাটি বিক্রি করে ।
ধান খাইল বানেরে ভাই পরিয়া খাইল জলে,
কি ব্যাচেয়া খাজনা দেমো পাইরস্ত সকলে ।
ধান বানে খাইলরে ।

মদনকামের গান

মদনকামের পূজা ও গান সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ের 'লৌকিকদেবতা ও তাহাদের বিশিষ্ট পূজাবিধি' পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই পূজাকে বসন্ত উৎসবের পূজা বলা যেতে পারে। কামদেব মদনের পূজা করাই হচ্ছে এই পূজার মূল বিষয়। কিন্তু এই পূজার গালাগানে দেখা যায় বাজ অর্থাৎ কার্পাস তুলার চাষ, কাপড় তৈরীর কথা, বিভিন্ন বাঁশ সৃজনের নানাকথা। মদনকামের পূজাকে বাঁশপূজাও বলা হয়। সম্ভবতঃ দীর্ঘাকৃতি বাঁশের গায়ে কাপড় জড়িয়ে মাথায় চামর দিয়ে সাজিয়ে পূজো করা হয় বলে বাঁশপূজাও বলা হয়। এই পূজার শেষের দিকের গালা-গানের অংশে হর-পার্বতীর কথাও থাকে। হরের পূজোয় ভাঙ এর প্রয়োজন হয়। সেজন্য ভাঙের চাষ করা ও ভাঙ খাবার বর্ণনাও গালাগানে পাওয়া যায় —

'পরখোয়েতে খাইল ভাং আন্দা ধরম।
তার পরে খাইল ভাং ধানের খানখিরি ॥
আগিনার মধ্যে খাইল ভাং আঁগিনার তুলসি।
হালুয়া সবে খায়া ভাঙ হাল জুরিবার যায়।
নাঙলের ঘোষ পরি হাড়েয়া বন্ধার মত চায় ॥
মাঝি সবে খায়্যারে ভাঙ মাছ মারিবার যায়।
মণ্ডলদেবে খাইল ভাঙ নাই খায় মাটিয়া।
কোন দেবে নাই খান ভাঙ নেও বেলি বাটিয়া ॥

সত্যপীর

উত্তরবঙ্গ ও পোয়ালপাড়া জেলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে লোকদেবতার পূজা হয় তিনি সত্যপীর। রাজবংশী সমাজের মধ্যে বাড়ীতে কোন অমঙ্গল হলে সত্যপীর ফকিরকে ডেকে এনে পূজা দেবার বিধান আছে। সত্যপীরের গালাগানের মূল ভূমিকায় যাকে অবতীর্ণ করা হয় তাঁকেই ফকির বলা হয়। ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায় এ প্রসঙ্গে এই সত্যপীরকে 'হিন্দু ইসলাম সংস্কৃতি সমন্বিত দেবতা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের যে কেউ যোগ্যতানুসারে ফকির হতে পারেন। পূজোর দিন গৃহস্বামীকে উপবাস পালন করতে হয়। বাড়ীর ভেতরের উঠানের পশ্চিমদিকে কলারপাতে করে কাচা দুধ কলা ও চিনি দিয়ে ছিন্নি তৈরী করে নবুদ অর্থাৎ নৈবেদ্য সাজাতে হয়। পূজোয় কোন মন্ত্র নেই। লোকবিশ্বাস- এই ফকির পূজো পেলেই সত্যপীর দেবতা তুষ্ট হবেন এবং বর দেবেন। কোন অলঙ্কারমা প্রবণের উদ্দেশ্য থাকলেও এই পূজা করা হয়।

পূজার সময় হেলি পৌষমাসের শেষ থেকে আরম্ভ করে বৈশাখ মাস পর্যন্ত চলে এই পূজা। তখন এই পূজায় পালাগানের অনুষ্ঠান হয়। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ ঠাকুর মূলত যে একই দেবতা সে সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "গ্রাম্য দেবতার পূজাগুলি, যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপীর এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানের পীরকে লোকে যখন পূজো দিতে আরম্ভ করল অমনি তাকে সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে বুজরুকির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন।"[৮] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুমান আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর অলৌকিকতা সিদ্ধ কোন মুসলমান ফকীর বা পীরকে অবলম্বন করে তার সমসাময়িক কালে বা তার তিরোধানের কিছু পরে এই সমস্ত পাঁচালী গান রচিত হতে পারে।[৯] এই জাতীয় হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়কারী লোকদেবতার পূজা ও পালাগানের ধারাটি উত্তরবঙ্গের তুলনায় গোয়ালপাড়া জেলায় অধিক পরিমাণে প্রবহমান আছে বলে মনে হয়। গোয়ালপাড়া জেলার চাপর অঞ্চলে প্রচলিত সত্যপীরের জন্ম সম্বন্ধে পালাগানে আছে —

একদিন সত্যপীর চান করিতে যায়
নূর নদীর ঘাটে যায়া কোরাণ হারা পায়।
সালাম করিয়া কোরাণ তুলি নিল মাথে,
আনন্দে চলিয়া গেল পিতার সাক্ষাতে।
কোরাণ দেখিয়া বামুণ করিলে সালাম
আমরা ব্রাহ্মণ জাতি কোরাণে কি কাম।
সত্যপীর বলে পিতা শুন মোর কথা
আমাক পড়াও পিতা কোরাণের কথা।
ব্রাহ্মণে কোরাণ পড়ে কোন্ শাস্ত্রে কয়
যাতে পাইয়াছ কোরাণ তাতে খুইয়া আয়।[১০]

সামাজিক নকসাজাতীয় - চোর চুরনীর গান।

রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রচলিত 'চোর চুরণীর গান' প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল ও জলপাইগুড়ী জেলার মধ্যেই বহুল পরিমাণে প্রচলন আছে। এই ~~প্রকার~~ গানের প্রচলন কুচবিহার কিংবা গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে নেই

বললেই চলে । ননীচোরা শ্রীকৃষ্ণের ভাবমূর্তির আদলে চোরচুরনীর নায়ক চোর এবং নায়িকা চুরনী । এই গানের দলে সাধারণত: দশ থেকে বারো জন গাইয়ে ও বাজিয়ে থাকে । এই গানের দলে সাধারণত: দশ থেকে বারো জন গাইয়ে ও বাজিয়ে থাকে । এই গানের সাথে নাচেরও প্রচলন আছে । সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলন থাকে এই গানে ।

ড: চারুচন্দ্র সান্যাল Rajbansi's of North Bengal গ্রন্থে বলেছেন It begins from the next day of Kali Puja in the month of Kartik (October-November) and continues for two weeks upto the full moon night, the Rash Purnima. The Party collects subscription in the form of money, rice and vegetables from the villagers. ১১ রাস পূর্ণিমার রাতের পর দিন গানের দলটি এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে সাময়িকভাবে কুড়েঘর বানিয়ে তাতে কালিদেবীর পূজো দেবে ও পরে মাঠে উপস্থিত সবাইকে সেই পূজোর প্রসাদ বিতরণ করবে । দলটি গ্রামের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী নেচে গেয়ে টাকা পয়সা, চাল সংগ্রহ করে ফেরে । কোথাও বা প্রতিযোগিতার আসর বসে । এই গানের আসরে চুরণী প্রথমে এসে চোরের ঘরে সংসার করার জন্য নানা অভাব অভিযোগের সমালোচনা করবে । পরক্ষণে চোর তার উত্তর দেবে । অনেকটা কবির গানেরলড়াই-এর মত ।

আজ থেকে পঁচাশী বৎসর পূর্বে দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল থেকে বাবু প্রসন্ন চন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও G.A.Grierson কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে সর্বপ্রথমে চোরচুরণীগানের যা নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে চোর-চুরণীর সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্যের যে প্রতিচ্ছবি পাই তা সর্বকালের সর্বহারা চোর সমাজেরই প্রতিফলন ।

চুরণী — চোরা যা যা যা যা চুরি করিবা,
ঘরের আগা পাছা দিয়া, কতই ধান আছে পাকিয়া,
জমির ধান পাকিয়া আছে রং রং করিয়া,
খরায় পুটিক্ (যৎসামান্য) চাউল আছেরে চোরা,
অবলুকার হোবে (একবেলার হবে)ছুয়া (সন্তান) কিখাবে,-
বিহানে উঠিয়া ।

চোর – সারা রাতি দিনে চুরি কি করা যায় ।
রাত কাটিয়া শীত ভাঙিয়া,
মোর শরীর শুকায়া যায় ;
শিয়াল কুকুরের মত বেড়া নাহি যায় ।
কত কষ্ট চুরি করিতে,
একদিন মুই গেছ, তোর বহন্ গেছে
সেদিন যাত্রা মিছা হইচে ম
পিরন্তের ঠেলা পায়া
তোর বহন্ পালায় হাতাসে,
চাকাৎ চিকিৎ ডাকাৎ ডিকিৎ
আগুন জ্বলেছে ;
শালার ঘরের চারটা কুকুর
বাতাসে ডুকে,
টাটার গোর (গুহ্যদেশ) চাপিতে মোর
জিউটা কাঁপে হাতাসে ।

আজ থেকে ষোলো বৎসর পূর্বে জলপাইগুড়ী জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত চোরচুরণী গানের উদাহরণ :

চুরণী – তিন কাচালে যাছে মোর জীবন
ও মোর চোরারে ।
চোরা ভাতার দশা পড়া,
সেই তানে মোর কাপাল পড়া
মোর অভাগীর দুঃখের নিশি
আর কি পহায় রে ।

চোর – সুখ শান্তি মোর আর হবে না
এককেরি মোর দিন যাবে -
যা আছে বিধাতার লেখা
কায় আর খণ্ডাবে ।
বছরে বছরে পড়িস্ নাপেরা,

খানি তিন কাচাল চুন্নী খানি তিন কাচাল,
তোর কাখাতে ওগো চুন্নী মুই ছাড়িনু হাল[১৩]
এইবারে ব্যবসা ধরনু ডাল ।

ভাওয়াইয়া গান - সুরবৈচিত্র্য - সমাজচিত্র

ভাওয়াইয়া গানের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য —

"ভাওয়াইয়া গান ভাবমূলক একক সঙ্গীত, প্রেমই ইহার একমাত্র উপজীব্য । সেই সূত্রে ইহা আঞ্চলিক সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও প্রেমসঙ্গীতের অন্তর্গত । উত্তর বাংলার দুর্গম তরাই অঞ্চলের স্তব্ধতা এবং দ্রুত প্রবাহিত নদনদীর ক্ষিপ্র গতির মধ্য দিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীর একটি বিশিষ্ট চরিত্রগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, এই সঙ্গীত এই আঞ্চলিক চরিত্রগুণের অন্তর্নিবিষ্ট । অরণ্য প্রকৃতির স্তব্ধতার মধ্য হইতেই ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতের সুরে দীর্ঘটানের জন্ম হইয়াছে, ইহার দীর্ঘ টান কিংবা চড়া সুর সম্পূর্ণ ভাটিয়ালির মত নহে, ভাটিয়ালির সুরে যেমন ভাঁজ নাই, কিন্তু ভাওয়াইয়ার দীর্ঘ একটানা চড়া সুরের মধ্যে ভাঁজ আছে ; অবশ্য এই ভাঁজ তালপ্রধান সঙ্গীতের মত স্পষ্ট নহে । ভাঁজের ভিতর দিয়াও একটানা চড়া সুরের গতি ব্যাহত হয়না । " (বাংলার লোকসাহিত্য পৃ: ১৫৮) ড: ভট্টাচার্য যাকে সুরের 'ভাঁজ' বলেছেন তার মধ্যেই রয়েছে ভাওয়াইয়া গানের মূল চাবিকাঠি । এই ভাঁজকেই উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলায় ঢ্যাক বলে । এই ভাওয়াইয়া গানের একটানা চড়া সুরের মধ্যে চিররসনিস্যন্দি ঢ্যাক বা ভাঁজ সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ, রংপুর ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া আর অন্য জেলাবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি ।

এবারে ভাওয়াইয়া গানের সুর বিন্যাস ॥

১৭ কামরূপী উপভাষার আঞ্চলিক নামকরণ অনুযায়ী ভাওয়াইয়া গানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : —

১। ফীরোন ভাওয়াইয়া – এই গানে দোতোরা বাজানোর ঢঙ বা রীতিকে বলা হয় ফীরোন ভাং (stroke) গান প্রথমে কিছুটা নিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে পরে উচ্চগ্রামে যায়। এই গানে 'ফীরোন' নদীর ও উল্লেখ অনেক সময় পাওয়া যায়।

২। চিতান ভাওয়াইয়া – সাধারণত: এই গান অস্থায়ীতে উচ্চগ্রাম হতে আরম্ভ হয়ে ক্রমেই নিম্নগ্রামে নেমে আসতে থাকে।

৩। দরীয়া ও দীঘল নাদা ভাওয়াইয়া – এই গানের সুরে দীর্ঘশ্বাস প্রয়োজন একটা আবশ্যকীয় বিবেচনার - দীর্ঘলনাদা বলা হয়। দরীয়া ও তাই।

৪। গড়ান ভাওয়াইয়া – একে শ্রীবিরেন্দ্র নারায়ণ মণ্ডল মহাশয় 'করুন' ভাওয়াইয়া বলে আখ্যাত করেছেন। অর্থাৎ করুণরসপ্রধান। শ্রীহরিশ্চন্দ্র পালের ভাষায় " বিরহ বেদনা কাতর নারীর যেন ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা "

৫। সোয়ারী চাল বা মইষালী চাল – মইষালদের গাওয়া গানকে সোয়ারীচাল বলা হয়। চাল অর্থে ঢং বা রীতি। চলমান মহিষের পীঠে দোতোরা বাজিয়ে যেন দুলতে যাওয়ার ছন্দকেই সোয়ারী ছন্দ বলা হয়। ভাওয়াইয়া গানের বিশেষজ্ঞ ও উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি ভাওয়াইয়ার সংকলক শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল মহাশয় এই গানের তাল সম্বন্ধে বলেছেন, "ভাওয়াইয়া গান সাধারণত কার্ফা তালে গাওয়া হয়।"[১৪]

বাংলা ও আসামের লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায়,

"অপূর্ব লোককাব্যের দিক ছেড়ে দিলেও, শুধু মেলোডির আকুতি ও তীব্রতার দিক দিয়ে বাংলা কেন ভারতের লোকসংগীতের বিরল সম্পদ এই ভাওয়াইয়া।"

ভাওয়াইয়ার সুর প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন, "ভাটিয়ালী সাধারণত: নিচের বৈবতে বিরাম নেয়। সাধারণত তা পঞ্চমে নামতে দেখা যায় না। কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে তা সঞ্চারীতে সঞ্চমে নেমে এক বিশেষ স্বাদের সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি ভাওয়াইয়া। রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি ভাওয়াইয়ার স্বাদ ভিন্ন,

আবার আসামের সীমান্তে প্রবেশ করে গোয়ালপাড়া, গৌরীপুরে সেই ভাওয়াইয়ার আর এক আমেজ পাই ।"[১৫] (পৃ: ১৫৫ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : - বাংলা ও আসাম)

গৌরীপুর রাজপরিবারের প্রমথেশ বড়ুয়ার সহোদরা ভগিনী নীহারবালা বড়ুয়া ভাওয়াইয়া গান প্রসঙ্গে বলেছেন, " এই ভাওয়াইয়া গানগুলির নব্বই ভাগই প্রণয়মূলক এবং তার বহুলাংশই সমাজ ব্যবস্থার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত পরকীয়া প্রেমেরই চিত্র । গানের অধিকাংশই মেয়েদের জবানীতে তাদেরই ব্যথা বেদনা বিরহ মিলনকে ঘিরেই রচিত । তবে সেগুলি যে মেয়েদেরই রচনা সেকথা মনে করবার কোন কারণ মেলে না "।[১৬] তিনি যথার্থই বলেছেন গানগুলির শতকরা নব্বই ভাগে আছে পরকীয়া প্রেমেরই চিত্র এবং মেয়েদের জবানীতে তাদেরই ব্যথা বেদনার কথা । এই ভাওয়াইয়া গানকে গোয়ালপাড়া জেলায় বেতারকেন্দ্র ও সরকারী প্রচার ব্যবস্থায় 'গোয়ালপারীয়া গান' হিসাবেই প্রচারিত হয়ে আসছে । উত্তরবঙ্গের ও বাংলাদেশের মধ্যে এই গানের জেলাভিত্তিক নামকরণ শোনা যায়নি । ড: হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, "ভাওয়াইয়া প্রেমের গান । আরও তীক্ষ্ণভাবে দেখলে বলা যায়, প্রোষিতভর্তৃকার গান বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের গান । নারীর বিরহ ব্যাকুলতাই এ গানের মর্মবাণী । নায়ক কোথাও সাধু, নাবিক, মৈষালবন্ধু, জাহুত বন্ধু, [illegible] কোথাও বা রাখাল, কোথাওবা বৈদ ।"[১৭]

ভাওয়াইয়া - সমাজচিত্র

ভাওয়াইয়া গান হোল ভাবের গান । প্রেমের বিরহ ব্যাকুলতার প্রকাশ এই গানের প্রধান উপজীব্য বিষয় । সবচেয়ে উল্লেখনীয় ব্যাপার এই যে, গানগুলির শতকরা নব্বুই ভাগ নারীমনের বিরহ বেদনার গভীর আর্তির সুর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও কোন নারী কর্তৃক এই গান-এর রেওয়াজ করার প্রথা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কোথাও ছিল না । স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে এই গান শহরের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত হিসাবে মেয়েরা ক্রমেই অধিক সংখ্যক হারে গাইবার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে । বর্তমানে এই ভাওয়াইয়াগান উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপারা জেলার সর্বত্র নানাধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েরা সবাই সমানভাবে গেয়ে থাকে ।

নারী মনে প্রেমের প্রত্যাশা ও ব্যর্থতার সংবাদে ভাওয়াইয়া গানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে আছে । শুধু যে নারীমনের কামনা বাসনাকেই ভাওয়াইয়া গানের রসভাণ্ডার পূর্ণ হার আছে তাই নয় পুরুষের প্রেমজীবনের ব্যর্থতা, ভালোবাসার কামনার পাত্রীকে হারানোর সুরেও ভাওয়াইয়াগান মুখর হয়ে আছে ।

ভাওয়াইয়া গানে সমাজচিত্র । আই মুই দুসুকের কথা কার বা আগে কং (১ নং) গানটিতে চিরন্তন বিরহিনী নারীর মনের দুঃখের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ।

আইমুই শুইয়া থাকোং একনারে ঘড়ে
আই মোর স্বামী নাই বগলে ।
বালিস ও ভিজিয়া যায়
দুই নয়নের জলেরে
আই মুই দুসকের কথা কার বা আগে কং ।

কিন্তু প্রশ্ন হোল যে নারী একলা উলের মশারী টানিয়ে নিদ্রাবিহীনরাত স্বামীর বিহনে কাটাচ্ছে যার দুই নয়নের জলে উপাধান সিক্ত হয়ে যাচ্ছে - অথচ পরপুরুষের দোতরার ভাং (বাজনা) শুনে তার মন আর একা ঘরে পড়ে থাকতে চাইছে না । এখানেই হোল ভাওয়াইয়া গানে পরকীয়া প্রেমের স্বাতন্ত্র্যতা ।

ব্যাপই চ্যাং এরা রে (২নং) গানটিতে নারী তার অল্পবয়স্ক তরুণ প্রেমিককে 'লুট করিয়া' প্রেম নিবেদন করছে। লুট করিয়া এখানে সঙ্গোপনে। তার তরুণ প্রেমিক গোরু নিয়ে গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছে। গানে সে এতই বিভোর ইসারা করে ডাকা সত্ত্বেও সে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছে না। চোখের ইসারা করছে তবু সে দৃক্‌পাত করছে না। এতে তার ব্যথাহত নারী মনের অভিমান ফুটে উঠেছে এইভাবে :-

শইরষার ফুলে যেমন জমীনের শোভা
মোর নারীর ত্যামনে ঢালুয়া খোপা।
তোরে মোরে বিধি নাই ন্যাখে জোরা।

জমানের প্রান্তরে উত্তর বাংলার মেঠোপথের দুধারে যেদিকে তাকানো যায় ধু ধু মাঠে শুধু শ্ষরষের ফুলের হরিদ্রাভ বর্ণচ্ছটার রংবাহার। গ্রাম্য নারীর কাছে প্রতিনিয়ত এই ফুল এর বর্ণচ্ছটা তার সত্তার সাথে মিশে আছে তাই তার মাথার চুলের খোপার সাথে এই শর্ষে ফুলের তুলনা ছাড়া আর কীই বা দিতে পারে।

বনদু ধন মোর ধন রে (১১নং) গানটিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রেমিক বন্ধুর প্রতি অভিমানাহত নারীমনের করুণ আর্তি। নিষ্ঠুর বাপ মায়ে ছোটবেলাতেই তাকে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে দেখতে দেখতে সে ঋতুমতী নারী হয়ে যৌবনবতী হয়ে উঠল, "দ্যাখিতে দ্যাখিতে গাবুর হনু
রবিবারের দিন মাতা ধুনু"

পাড়ার ছেলেরা তার রূপযৌবন দেখে হায় হায় করছে। এমনিভাবে আমরা ভাওয়াইয়া গানে প্রোষিতভর্তৃকা নারীর অন্তর্বেদনার সুর শুনতে পাই।

চট্টগান।

ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখার নাম চট্টগান। এই গান মূলতঃ হালকা রসের হয়। ভাওয়াইয়ার মত ভাবের গভীরতা এতে অনুপস্থিত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই গান প্রসঙ্গে বলেছেন, " ভাওয়াইয়া গানে গুরুগম্ভীর বিষয় ও দীর্ঘটানের সুর ব্যবহৃত হয়, লঘুস্তরের বা চট্টদার বিষয় ও ক্ষিপ্রতালের সুর অবলম্বন করিয়া চট্টগান রচিত হয়।"[৮] তিনি যথার্থই বলেছেন যে চট্টগা

গানের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য । গ্রাম্য মানুষের সরল বিশ্বাস ও সীমিত বুদ্ধি নিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে তারই ফলশ্রুতিতে যৌবনকালের পিরিতি যে কত মধুর তা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে নিম্নের এই চট্‌কা গানটিতে —

"মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা
পিরিত করিলং গাবুর বেলা
হায়রে পিরিত কাচা দুইয়ের হাড়ী ।
মিটাইর মধ্যে জুলাপী দুধের ছানা ঘী পুরি
বন্ধুক খোয়ায় হাটে আর বাজারে ।"

মইষালী ডাওয়াইয়া বা মইষাল বন্ধুর গান ।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলার সংরক্ষিত বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে মইষের রয়েছে 'বাথান' । এই মহিষের পালকে যারা চড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদের বলা হয় মইষাল । এদের একরকম নিঃসঙ্গ ও বন্য জীবনকে কেন্দ্র করে যে ডাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বলে মইষাল বন্ধুর গান । মাহুত বন্ধুর গানের মত কইন্যা ও মইষালের মধ্যে কথোপকথনের নাটকীয় ভঙ্গীটিতে ধরা পড়েছে এদের বুনো জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে কইন্যার প্রেমের আহ্বান কি সহজ সাবলীল উদাত্ত ও মাধুর্য্য মণ্ডিত —

কইন্যা — ওকি মইষাল বন্ধুরে
বকুনা মইষের দুধ ও ধরি
যান মইষাল আমার বাড়ী
খায়া আইসেন নবীন বাটার পান ।
খায়া দেখেন মইষাল কেমন মজা পান ।
মইষ চড়ান ওহে মইষাল কোন বা কাড়ের মাঝে ?
মইষালং মইষ চড়াই ওহে কইন্যা ঘাটের উজানে,
ঘাঁটির ডাঙ কি তোমরা নাই শোনেন কানে ?
মইষ চড়াই ওহে কন্যা সান বান্দা ঘাটে ।

কইন্যা — তোর মইষালের এমনি মায়া
বুঝাইতে না মানে দেহা
তোমার সনে মইষাল কেমনে হব দেখা ?
মাকালেরো ফল যেমন মোর নারীর যৈবন তেমন,
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন মোর নারীর যৈবন তেমন
ওকি মইষাল বন্ধুরে ।

মইষ চড়ানোর জন্য বাথানে যেতে হয় মইষাল স্বামীকে । যুবতী স্ত্রীর মনে কত অজানা আশংকা ভীড় করে দাঁড়ায় । নদীর বিস্তীর্ণ চর অঞ্চলের বনবাদারে যে সমস্ত কম বয়সী 'চ্যাংড়ী' মেয়ে থাকে তাদের প্রতি অনুরাগবশত: যদি সে তার কথা ভুলে যায় । মইষালের যুবতী 'কইন্যা'কে তার ভরা যৈবনের' জ্বালা নিয়ে ঘরে ফেরার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অজানা আশঙ্কায় দিন গুণতে হবে এজন্য তার বেদনা বিক্ষুব্ধ মনের ধিক্কার বাণী ঘোষিত হচ্ছে মইষালের উদ্দেশ্যে —

ধিকো ধিকো ধিকো মইষালরে মইষাল ধিকো গাবুরালী
এ হেন সুন্দর কইন্যাক কেমনে যাইবেন ছারি মইষাল ও ।
তখনে না কইছং মইষাল না যান চরুয়া পারা,
চরুয়া পারার চ্যাংড়ীগুলা জানে গুয়া-পড়া মইষাল ও ।
ভার বান্দেন ভারাটি বান্দেনরে, মইষাল বান্দেন মাতার ক্যাকা,
আজি কেনে দেখোং মইষাল ছারিবেন আমার দ্যাশ মইষাল ও
তোমরা যাইবেন বাতানরে মইষাল আমার পোড়ে হিয়া,
এ হেন সোনার যৈবন মইষাল কি রাখিম মুই
কাপড়ে বান্দিয়া মইষাল ও ।

মাহুত বন্ধুর গান

কোচবিহার এবং গোয়ালপাড়া জেলায় হাতি এবং হাতির মাহুতকে কেন্দ্র করে একপ্রকার ভাওয়াইয়া সুরের গান প্রচলিত আছে । এই ধরণের গানে যেমন একদিকে আছে বুনো হাতিকে ধরে পোষ মানানোর জন্য মাহুতদের নিজস্ব গান কখনো বা

মাহুতের বুনো ও হনুছাড়া জীবনকে কেন্দ্র করে মাহুত ও কইন্যার মন দেয়া নেয়ার গান। সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে এ গানগুলি অনেকটা মইষালী ভাওয়াইয়ার মত —

কইন্যা — "খাটো খুটো মাহুতরে তোর মুখে চাপা দাড়ি
সত্য করিয়া কওরে কথা ঘরে কয়জন নারী ?
তোমর পেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে।

মাহুত — হস্তী নরাং হস্তী চড়াং হস্তীর গায়ে বেড়ী
সত্য করিয়া কইলাম কথা বিয়াও না করি কন্যাহে।"

(গ) আধ্যাত্মিক সঙ্গীত।

উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলায় আধ্যাত্ম সঙ্গীত বোঝাতে আমরা দেহতত্ত্ব, তুক্কা, গুপুনীনাম, আইনাম, মনোশিক্ষা প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। তবে বাংলার আধ্যাত্মসঙ্গীতের মত এতদ-চলের দেহতত্ত্ব, মনোশিক্ষা প্রভৃতি গানের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তবে তুক্কা গানের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রয়েছে কিছুটা। তুক্কা গান বৈরাগী ছাড়া আর কেউ গায় না। এই গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধানতঃ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাহাত্ম কীর্তন করা হয় যেমন —

' পার কর গৌরাঙ্গ ভবে, হরি তরঙ্গ তুফানেতে
পার কর গৌরাঙ্গ ভবে।'

রাধাকৃষ্ণের যুগলচরণ অন্তিমকালে দর্শনের ইচ্ছার কথাই প্রভু গৌরাঙ্গকে বলা হয়েছে পদটিতে। কিংবা গৌরাঙ্গের ভাববিহ্বল বর্ণনায় আছে —

' একজন ভাবের মানুষ এই যাচ্ছে গো, নয় গো এদেশী
ও তার নাম আনিতা, তারে চিনি গো নবীন বয়সের সৈন্যাসী'

দেহতত্ত্বের গান প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, " ইহার মধ্যে কালক্রমে নানাভাবের সংমিশ্রণ হইলেও ইহার মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ সকল শক্তির আধার এবং ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র

অবলম্বন, ইহার তুষ্টিতেই সকল সাধনার সিদ্ধি। সেইজন্য ইহার মূল কথা হইতেছে — 'তরবি যদি ভব নদী নারী সঙ্গ কর।' [১৯] কিন্তু এতদঞ্চলের 'দেহতত্ত্ব' বলে প্রচলিত গানগুলি যারা করেন সে গানগুলির মধ্যে 'এ দেহার গৈরব মিছা' বলেই বার বার নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন। যেমন এই গানটিতে বলা হয়েছে —

এ দেহার গৈরব মিছা, জলের ভুলুকারে
উড়িয়া যাবে পবনপাখী পরিয়া রবে দেহা

এবং সেই দেহা ছেড়ে যে পবনপাখী একদিন উড়ে যাবে তাকে তো ত্রিপাণীর ঘাটে যেতে হবে যেখানে গিয়ে 'সাধু জনায় হবে পার পাপী জনার মানা'। দেহরূপী খাচার মাঝে বাউলের 'অচীনপাখী' কেমনে আসা যাওয়া করে বাউল যেমন জানে না দিনাজপুরের ধর্মভীরু সরলপ্রাণ গ্রাম্য মানুষেরা মনরূপ সুয়া পাখীর কাছে একই আর্তি জানাচ্ছে যে মনসুয়া তার দেহ পিঞ্জরকে 'আন্ধার' করে একদিন ছেড়ে যাবে —

ওকি মনসুয়া
একদিন ছাড়িয়া যাবুরে দেহাটা আন্ধার করিয়া।
কেউ নিবে খোন্তা কোদাল রে মন কেউ নিবে রে খড়ি
নিধুয়া পাখারে ও মন বান্ধিয়া দিবে বাড়ীরে।'

কোচবিহার জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী গোয়ালপাড়া জেলাতেও দেহার গৈরব না করার জন্য বার বার বলা হয়েছে —

মানব দেহা মাটির ভান্ড
ওরে ভাঙিলে রে হইবে খন্ডরে খন্ড
ভাঙিলে দেহা জোড়া লাগে না
হরি বলো মন রস না
মানব দেহের কেউ গৈরব কৈরো না।

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এবং জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত মনোশিক্ষার গানে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার স্ফুরণ ঘটেছে —

আমি আশ্চর্য এক নদী গো দেখিলাম
উপরে যার তলি।

যত জাহাজ নৌকা মারা যাছে
ও শুনি যে নদীর খলখলি ।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত (কোচবিহার জেলার) মনোশিক্ষার গানকে বলা হয় 'মইচ্ছা' । যেমন —

শুন ভাই মমিনা মনে কর ভাবনা
দুইদিন পরে যেতে হবে সবজনা
এই যে মানব জীবন বড়ই চঞ্চল বিচার করে দেখনা
জীবনের সঙ্গে দেহের মিলন কয় দিনা ?

এছাড়া গোয়ালপাড়া জেলার কামরূপ জেলা সংলগ্ন অঞ্চলে মেয়েরা যেসমস্ত কীর্তন করে তাদের বলা হয় আইনাম । 'গুপুনী' কথাটির মনে হয় সৃষ্টি হয়েছে 'গোপী' থেকে । এই গোপী থেকেই সম্ভবতঃ গুপুণী নামের সৃষ্টি হয়েছে । এই গানও মূলতঃ মেয়েরা করে থাকে ।

এবারে উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের কিছু নির্বাচিত সংকলন তুলে ধরা হোল : —

(খ) আধ্যাত্মিক সঙ্গীত

কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমায় প্রচলিত ।

দেহতত্ত্বমূলক

১

এ দেহার গৈরব মিছা, জলের তুলুকা রে
উড়িয়া যাবে পবন পাখী পরিয়া রবে দেহা ।
ও তোর পরিয়া রবে দেহা মনরে ।
ঘরখানি বান্দিলেন মনরে মাপিক বাঁশের উয়া,
সেও ঘরত বন্দিতে নাদে দারুন বিধতা ।
ত্রিপাণীজা ঘাটে মনরে, যত দেবের থানা
সাধুজনায় হবে পার পাপী জনার মানা ।

২

ওকি ও সাধুরে মোনটা গাছের একটা গোরা
তার কয়টা ডাল ভাই কয়টা পাতা ।
বুঝিয়া দিনে সাধু জানা যায়
রাস্তা ঘাটা ভালো নয় রে ।
পন্থের কাটা দেখা যায়
সেই মানুষটার করোরে উপায় ।
পার হবার সকলেই চায়,
পারের মানুষটা কায়রে কায় ।
ও সাধু মহাশয়, সেই মানুষটাক চিনিয়া দিতে হয় ।

৩

মুস্লিম রচিত দেহতত্ত্ব বা মইচ্ছা ।

শুন ভাই মমিনা, মনে কর ভাবনা
দুইদিন পরে যেতে হবে সব জনা ।
এই যে মানব জীবন বড়ই চঞ্চল
বিচার করিয়া দেখ না ।
জীবনের সঙ্গে দেহের মিলন কয় দিনা ।
শুন ভাই মমিনা, মনে কর ভাবনা
গোরতে পুছরে ছোয়াল
রব তেরা কোন জনা ।
কি জবাব দিবে ভাইরে সেই দিনা ।
হাতে বাতি মাথে ছাতি
আর চিরুনীখানা গোরতে হইয়া যাইবে সব কানা ।
টেরিয়া সীতা লম্বা ধুতি, আর বাবুয়ানা
কোথায় যাইবে ভাইরে মরণের দিনা ।

৪

মুন্সিম রচিত মইচ্ছা মনোশিক্ষা ।

চক্ষু মুদিলে শরীল হয়রে পতন
নয়ন মেলে দেখনারে মন কথায় নিরঞ্জন ।
খোদা হাওয়ায় আইসে হাওয়ায় চলেরে মন
কেমনে পাবি তার দরশন ।
নয়ন মেলে দেখনারে মন কথায় নিরঞ্জন ।
দেহার আটকুটুরী নয় দরজা রে মন
কুন দরজায় বসে নিরঞ্জন,
নয়ন মেলে দেখ নারে মন কথায়া নিরঞ্জন ।
ও মন জীবনমরণ নিশার স্বপন রে মন
হায় হায় বুজিয়াও বুজ নারে মন ।
মাটির দেহা মাটিতে যাবে মাটিতে শয়ন ।
ও মন অশ্বিলে মরিতে হবে রে মন
হায় হায় নশ্বর এ জীবন,
তবে মরা দেহার গৈরব কেন
ওরে অবোধ মন ।

৫

বেরুবাড়ী অঞ্চলে প্রচলিত দেহতত্ত্বের গান

দেহ কয়ছে মনরে ভাই সঙ্গে মোক নিগালোনাই,
ভোরের মাঝে একলয়ে খুইয়া ছাড়িয়া কুন্ঠে যাসিতুরে ।
দনজনে ভাই এক সঙ্গে চল যাই ।
তুই ছাড়িলে মোক বান্দিবে শ্মশানে নিপিয়া করিবে ছাই ।
রে হে দনজনে ভাই এক সঙ্গে চল যাই ।
যতন করিয়া পিনুরায় পুষিলাম পোষাপাখীর মত,
দুই দুধ ঘৃত ননী খাওয়াইলাম মন তোক কতমরে

ফল মূল ব্যঞ্জন নানান দ্রব্য সংসারেরই মতমূরে ।
তুই ছাড়িলে মোক বান্দিবে শ্মশানে নিশিয়া করিবে ছাই ।

৬

গোয়ালপাড়া জেলায় প্রচলিত মনোশিক্ষা

ভবে আসিয়া রে মন কি কাম করিলং
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পায়া হরিক না ভজিলং ॥
কেশ পায়া মুই না পিন্ধিলুং হরিহে, তুলসীর শিক্ষা ।
মুখ পায়া না নিলুরে হরির নামের দিশা ॥
হস্ত পায়া মুই না করিলুং হরিহে শরীরের মার্জন ।
কর্ণ পায়া না শুনিলরে এসব কীর্ত্তণ ॥
আঁখি পায়া মুই না দেখিলুং এতিন ভুবন ।
মৃগ পশু হয়া খাইলং রে তৃণ বৃন্দাবন ॥

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত

তুপ

১

পার কর গৌরাঙ্গ ভবে, হরি তরঙ্গ তুফানেতে
পার কর গৌরাঙ্গ ভবে ।
আর ভবে এসে আমার কিনা হবে
শূন্য হাতে আমাক যেতে হবে
মনরে রাধা কৃষ্ণর যুগলচরণ পাই যেন অন্তিমকালে
পার কর গৌরাঙ্গ ভবে ।
আর গিরিনাথের আমার এই নিবেদন
চাই না গৌর আমার আর অন্যধন
মনরে ভব পারে পৈরে রবে, ভবের কামাই ভবেতে
পার কর গৌরাঙ্গ ভবেতে
হরি তরঙ্গ তুফানেতে, পার কর গৌরাঙ্গ ভবে ।

২

একজন ভাবের মানুষ এই যাচ্ছে গো, রয়গো এদেশী
ও তার নাম জানিতা, তারে চিনিগো নবীন বয়সের সৈন্যাসী
নয়গো এদেশী ।
একজন ভাবের মানুষ এই যাচ্ছে গো, নয়গো এদেশী ।
তারে কোনবা দেশে আজা ছিল, কোন বা দেশ ভিকারী,
নয়গো এদেশী ।
ও তারে কপালে তিলকের ফোটাগো পায়েতে নাবাবলী
নয়গো এদেশী ।
একজন ভাবের মানুষ এই যাচ্ছে গো, নয়গো এদেশী ।

৩

ও মন তুই কেমন করিয়া রবিরে
হেমসাগর পাতালের মাঝে
ওরে ব্যাপার করিবার গৈইলং রে ভাই
ভব নদীর কূলে
ওরে কেউ করিলো ডেরা দুনা
কেউ হারাইলো মূলে
হেমসাগর পাতালের মাঝে
ওরে মাও কান্দে পুত্রের জন্য
বইন কান্দে ভাই
কলারও রমনী কান্দে
দুয়ো হইল মোর বালাইরে ।
হেমসাগর পাতালের মাঝে
ও মন তুই কেমন করিয়া রবিরে
ওরে গুরুর বাড়ীতে ফুলের বাগান
শিষ্যের বাড়ীতে দৈ
গুরু শিষ্যে দেখা না হয়
ডাকাডাকি সারো রে ।
হেম সাগর পাতালের মাঝে ।

৪

আমার মনতো ভালো লাগে না হে সই
মন মিলে, মনের মানুষ মিলে কৈ
এই যে মনের আগুন জ্বালিয়া তেগুন
জল দিলে আগুন নিভে কৈ
আমার মনতো ভালো লাগে না হে সই
এই যে মনেরি অনুরাগে ঝাপ দিলাম জলে
জলের কুম্ভীর আমাক খাইকেল কৈ
আমার মনতো ভালো লাগে নহে সৈ
এই যে জঙ্গলে বনে ঘুড়িয়া বেড়াই
বনের বাঘে আমাক খাইলেক কৈ ,
আমার মন তো ভালো লাগে নহে সই ।
শহরে বন্দরে ঘুড়িয়া বেড়াই
সাধু সঙ্গ আমার হইল কৈ
আমার মনতো ভালো লাগে না হে সই ।[২০]

বাউলগানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

বাউল গানের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ড: হরিপদ চক্রবর্তীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : —

"ভাওয়াইয়ার গায়ক হিসাবে 'বাউদিয়ার' উল্লেখ করা হয়েছে । বাউদিয়া শব্দের অর্থ ইতস্তত পর্যটনকারী খ্যাপাটে ধরণের লোক ; ব্যঞ্জনায় প্রেমের পাগল । কোন কোন লেখক বাউদিয়াকে বাউলের মত একটি সম্প্রদায়, সাধক সম্প্রদায় বলেও উল্লেখ করেছেন, বাউদিয়া সম্প্রদায়ের গাওয়া ভাওয়াইয়ার মধ্যে বাউলের সাম্প্রদায়িক সাধন সঙ্গীতের সদৃশ অথচ প্রকৃতিতে তরলতর এক ধরণের আধ্যাত্মিক মরমী গীতের সন্ধান পেয়েছেন । মনে হয় বাউদিয়া ও বাউল কথা দুটির এবং সেই সঙ্গে বাউল গান ও ভাওয়াইয়া গানের সুর ঝংকারে সাদৃশ্য দেখে এটা অনুমান করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে তত্ত্বসঙ্গীত আছে, কৃষ্ণকথাও আছে— তা হচ্ছে বিষয়ের বিস্তারে, সুরের সলীল সম্প্রসারণের বৈচিত্র্যে । যেমন বাউল সুরেও হালকা ব্যঙ্গ কৌতুক গীতের প্রচলন আছে । তার চেয়েও বড় কথা, বাউল এক ধরণের সাধন সঙ্গীত আর

ভাওয়াইয়া পরিপূর্ণভাবেই আঞ্চলিক গান।"[২১]

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাউল ও ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নকে সঠিক বলে ধরে নিতে মনে হয় কোন বাঁধা নেই কারণ এ কথাটা যথার্থ যে বাউল হোল সাধন সঙ্গীত আর ভাওয়াইয়া হোল একপ্রকার আঞ্চলিক গান। তবে উভয়ের মধ্যে যেখানে মিল রয়েছে সেটি হোল ভাওয়াইয়া গান যারা করেন অর্থাৎ যাদের নেশায় পেয়ে যায় তারা আচার ব্যবহারে হয়ে যান বাউদিয়া অনেকটা বাউলের মত। মিল অনেকটা রয়েছে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেও। বাউলে লাগে একতারা ভাওয়াইয়ায় লাগে দোতারা। মিল যতই থাক তবুও আমরা বলব বাউল গানের তুলনা বাউলগান আর ভাওয়াইয়া গানের তুলনাও ভাওয়াইয়া গান। দুটি ধারার মধ্যে সমতা থাকা সত্ত্বেও দুটি গানের বিষয় ও সুরের মধ্যে সু সু ক্ষেত্রে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

(ঘ) জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু কেন্দ্রিক গান।

সন্তান জন্মের সময় রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন প্রকার স্ত্রী আচার সম্পর্কে বিশদ ভাবে ৫ দশম অধ্যায়ের (ক) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়া পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজবংশী সমাজে সন্তানের জন্মগ্রহণকালে কোন গানের প্রচলন নেই। তাছাড়া অন্যান্য হিন্দু সমাজের নানা শাখা প্রশাখায় কিংবা মুসলমান সমাজের মধ্যেও জন্মকেন্দ্রিক গানের কথা শোনা যায় না। তবে বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গান রয়েছে আমরা যথাস্থানে সে সমস্ত গানের আলোচনাও উদাহরণ তুলে ধরেছি।

বিয়ে উপলক্ষ্যে গান।

এই বিয়ের গানগুলি প্রধানতঃ ধুবরী মহকুমার পূর্বাঞ্চল এবং কোকরাঝার মহকুমার কিছু অংশে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু ধুবরী মহকুমার গোলকগঞ্জ থানা অঞ্চলেও এই গীতগুলির সঙ্গে মিলযুক্ত গীতের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। অভয়াপুরী ও শালকোচা অঞ্চলের কথ্য ভাষার রীতি এই গীতে আমরা লক্ষ্য করি। এই সঙ্গীতগুলি বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে পাত্র, পাত্রীর বাড়ী থেকে বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে যাত্রা করা পর্যন্ত সময়ে গাওয়া হয়।

১

শালগাছ কাটিয়া তারে করিম পীরা
তাতে ধুইম মুই নিমাইর পাঞ্জাবীরে ।
কাপড় ধুইয়া ধুবানী ভাবে মনে মনে
কি হতে সুকাইম মুই নিমাইর পাঞ্জাবীরে ।
চালাত সুকা দিলে চাল কুটা লাগিবে ।
বেড়াত সুকা দিলে কাকে হাগিবরে ।
হাতীর পিঠীত সুকাইম মুই নিমাই-র পাঞ্জাবীরে ।
ভইসের পিঠীত সুকাইম মুই নিমাই-র পাঞ্জাবীরে ।

বিয়ের কথা পাকা হবার পর নানাসমস্যার মধ্যে বরের কাপড় চোপড় তৈরী করে ধুয়ে পরিস্কার করে রাখারও তাগিদ আসে । উপরিউক্ত সঙ্গীতটিতে বরের বাড়ীর মেয়েরা বা পাড়া প্রতিবেশীর গিদালী মেয়েরা এই গানটি সম্মিলিত ভাবে গেয়ে থাকে ।

বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বর ও কনে উভয়ে উভয়কে জানার জন্য যে আগ্রহ জন্মায় তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই চিঠিপত্র লেখার তাগিদ আসে কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে দিচ্ছেন বাপ মায়ে তারা তো লিখতে পরতে জানে না কাজেই আর মন জানাজানির জন্য চিঠিপত্রও লেখা হয়ে ওঠেনা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ।

২

বিনাসী পারা সহরের মাঝে
বাইর হইচে কাগজ কল ঘরে
আনিয়া দেও মোরে ।
লেখাইয়ায় লেখে পড়াইয়ায় পড়ে
নাজানুই তোলা (লেখা ?) আমরারে ।
অবসকালে (কমবয়সে) মাত্রে
ছাওয়াল কালে করাইছে বিয়া
না জানে বাপ মাওরে
অবসকালে মাত্রে ছাওয়ালকালে মাত্রে ।

৩

আপদুয়ারে রাম কলা, রোদে ঝিলমিল করেরে
সুরজের ছাটা মারে ।
হরা (কমবয়সী পাত্র) আসে ছাওয়াল দামান
খিলা বাটুনমারেরে
পরাণের বাটুনমারেরে ।

পাত্র কন্যার বাড়ীতে আসার পূর্বে কন্যার বাড়ীর উঠানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে । বরের দৃষ্টি কী ধরণের হবে কন্যার বাড়ীর গিদালী মেয়েরা তারই বর্ণনা দিচ্ছে গান গেয়ে গেয় ।

৪

কাঠনের গাছে বান্দিয়ারে ঘোড়া
আলোনে দিল পারা
একেলা না যামুরে বিয়ার সাজে
কেহ যামুরে সঙ্গে ।
ভাই যাব ভাতিজারে যাব
বাবায় যাব সঙ্গে ।
তেঁওতে সগাই করুণা করে
দয়ার ভাইওর আগে ।
রাজায় লুটে ধন জনরে
পাইকে লুটে বাড়ী,
ভিনুদেশীয়া দামান লুটিয়া
বাসর করিব খালি ।

বর কণের বাড়ীতে আসা এবং বিয়ের পর কণেকে লুট করে নিয়ে যাবে কণের বাড়ীর গিদালী মেয়েরা তাই গাইছে ।

৫

কইনার বাবার বাড়ীর বক ফুলের গাছ
সেই না ফুল ফুটিয়ারে বাসে মুন্ মুন্ করে
কোন রে দেশ ঘুরা দামান এত রাইতে কেনে ।
আমার ছাওয়াল বানি ডোকে হয়রাণ হৈল নারে ।

বর বেশী রাত করে বিয়ে করতে এসেছে এদিকে অল্প বয়সের কণে বিধেয় হয়রাণ হয়ে উঠেছে তারই বর্ণনা রয়েছে গানটিতে

৬

আজি বালির রঙ্গ দিনরে আজি বালির শুভ দিনরে
নিত্যে আসুং নিত্যে যাওরে, ছাড়িয়া আজিকে রাতি
না যাওরে বালি ছাড়িয়া আজিকে রাতি ।
আজি বালির .....
হাসে বর মুখে গামছা দিয়া
আজি রাতি বালি না যাইঘরে ছাড়িয়া ।

আজকের কণের শুভ দিন । আজ শুভদিনের রাত্রে তাকে ছেড়ে তার বান্ধবীরা যে চলে যাচ্ছে না বিয়ের বাসরে তাই তাকে শোনাচ্ছে ।

৭

সুন্দর শ্যাওলাইলো (শ্যামলা) সিন্দুর পিরধান করে নারে ।
শুন শুন বাবাগো
কাচা নিন্দে বরুই (বর) আমাক তুলেরে
মোর সেন মনে হয়
সিন্দুর ঢ্যালেয়া বরুক আমরা মারিমরে ।
মারো মারো শ্যামলাইলো ।
তোর বাবার হুকুমে আমাক মারেরে
আমার দেশে গেলেরে
সিন্দুরে সাজেয়া মনের হাউস তুলিমরে ।

কণেকে বিয়ের বাসরে সিঁদুর পড়ানোর সময় গাওয়া হয় গানটি ।

৮

বুড়ী বালির কান্দনেরে
মুই ছাড়িয়া যাবার চাওরে
চান্দো উঠে বালি ধায়া
ধায়া সুরজ উঠে বালি খেমালি খেলায়

আজি বালির রঙ-এর দিনরে বিয়ার দিনরে শুভ
কান্দে বালি বাবার কোলে মার কোলে
আজিকার রাতি রাখরে লুকিয়ে ।

কণের কান্নায় বিয়ের আসরে থাকার জন্য মন চলে না । তবুও এই শুভদিনে কণেকে ছেড়ে যেতও মন চায়না । এদিকে কণে কেঁদে কেঁদে বলছে আজকের রাতটা আমাকে লুকিয়ে রাখো । বিয়ের আসরে কণে পক্ষের পিদালীরা এই গানটি গায় ।

গোয়ালপাড়া জেলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিয়ের গানের মধ্যে কতগুলি অজানা সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায় । মুসলমান সমাজে হিন্দুদের মত বিবাহিতা নারীর মধ্যে সিন্দুরের ব্যবহার আছে ২১ নং বিয়ের গানটিতে তার পরিচয় পাই —

'' তোমরা আসিলেন বড়ু বুবু ক্যানে নাই ?
সেন্দুর আবিনে বুবু আইসে নাই ।
শুনিয়া চায়া ক্যানে ভাতার ধরে নাই ?
সেন্দুর সীতে দিয়া ক্যানে আইসে নাই ?"

এবারে বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে প্রচলিত বিবাহের নানাধরণের আচারকে কেন্দ্র করে যে গান আছে তার উদাহরণ দেয়া হোল ।

কোচবিহার জেলায় প্রচলিত

৮

" উনু উনু মান্দারের ফুল
কইনার বাড়ী কত দূর ।
কইনা আসিল থামিয়া
ছাতী ধর টানিয়া
ছাতীর উপর গামছা
তিন মণীর তামছা ।
ঝারি আনো পানী খাই
কইনাক ধরি বাড়ী যাই
কইনার নাম কি ?

কইনার নাম দশী ।
আন পীড়া খান বসি
নাউ ধুম্ ধুম্ করে
জাউ ভাঙিয়া পরে ।
কি বউ তুই চিকন কালা
কইন্না ভাতোত দিচিস
যে কইন্না সেজে নাই
জাও অইর পাতোত দিচিস
বাঁশ বাড়ীত ফেলানু ছাই
বাঁশে ধইল্লেক নীলি
বাঁশ বাড়ীর কইনা ধুনা বড় সুন্দরী ।

বিয়ার গীত

দার্জিলিঙ জেলার তরাই অঞ্চলে প্রচলিত

(১০)

দাদা কইনা জুড়িয়া আনিলো পথা (বোবা)
মোর চাহিতে আরহো কইনারে ট্যাথা (উচা)
মাথার চুলিনা কেকেড়া কুকুড়ী
মুনের ছবিটা রাথা ।

(১১)

চ্যাঙরা দিনে বারে টাকা
বুড়া দিনে মোলো
বুড়ার সঙ্গে বেহা দিতে
কহোনা করে মানা ।
এই অ নারীর মরন হইনো না ।
বুড়ার বাড়ী গেলাম আমি
উচ্চা উচা ধারি,
আধা রাতি যায়া বুড়ার পথা টুরি ।

(১২)

হায়রে ভগবান ।
মোর এতয় নিদান ।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে
এতয় দুঃখ মা মোর কপালে
ওমা কিযে কইচু পাপকর্ম
দুঃখিয়ার ঘড় বুজি লিচু জনমো
পিতা মাবুকে ক্ষুধারপে মনমো (মর্ম)

(১৩)

ওমা ধৈর্য্য নাধরে
ডোকের ভাতার দুনাইমা হইলো আন্ধার
আর বুঝি প্রাণ বাঁচেনা ডোর বান্দার ।

(১৪)

দুঃখোতে ভাঙিল সংসার
ভাঙি গেইল মোর রসের বাজার ।
ওমা যার বা জন্যে কান্দে মন
রাস্তাতে পাজিলো বন
ভাগ্যে না হয় তার দরশন ।
ওমা শুভ কাজে পরে বাঁধা ;
কৃষ্ণছাড়া হইলো রাধা
এ দুনিয়াও পড়ে বাঁধা ।

গোয়ালপাড়া জেলায় প্রচলিত

(১৫)

বড় নদীর পারে পারে কিসের বাইজান বাজে ।
বাইজানটা নাহয় বাবা বালির জোরন আইসে ।
দুধ ভাত খায়া ময়না নিন্দ ভালা পেইচে ।

কোনবা মারেয়ার ব্যাটা হাওয়াই মারিয়া আইসে ॥
বন্দুকের হিরারে হিরি চমকিল যমুনার গাও ।
সুন্দর যমুনারে বানির ঝোড়ন আইসে ॥

গোয়ালপাড়া জেলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত

(১৬)

আমরা কই মাঁই মাঁই
মাঁই এর চউকোৎ পানি নাই,
এক কন্যার দুই শাড়ী
তেং কন্যার মন ভারী ।

(১৭)

কামরাঙা কামরাঙা জাও অই ভাতারী
কেটাই সেটাই খোঁজে রঙের সুপারী ॥
কইনার মাওগুলা নউতোন ছুকুরী
কেটাই সেটাই খোঁজে রঙের সুপারী ॥

(১৮)

আইসোরই চ্যাঙরিগুলা ফুল তুলিবার যাই,
ফুল তুইনতে ফুল তুইনতে মামার বাড়ী যাই ।
মামায় দিলেক একটা টাকা বউ কিনিবার যাই ।
বউ হইল তায় কামালি কই মাছটায় কোটে,
জামাইর পাতোত ভাত দিতে বউ ধোরোৎ ধোরোৎ মোতে ।

(১৯)

আল্লা ভুল্লোৎ ভাল্লাৎ বাউনের ভাত
চাউলিয়া হইচে ;
তিনটা ট্যাঙনা মাছ ছ্যাকা ধরাইচে ।
মায়ে কয় মোর ব্যাটিটা পানি নাইরে খায়,
বিছনা ভরে মুতিয়া থোয়

জাও অই ভাসিয়া যায় ।
শশুরী কয় মোর জাও অইটা
ভাল মানুষের পুত,
চৈন্দ হালের মানুষ নিয়া
ছ্যাকে বিচিনার মুত ।

(২০)

ডালা বানাইচেন রে বড়ু
ডলা ক্যানে তার নাই ?
বাঁশের পাতা ক্যানে বড়ু জোড়া নাগান নাই ?
তোমরা আসিলেন বড়ু বুবু ক্যানে নাই ?
সেন্দুর আবিনে (অভাবে) বুবু আইসে নাই ।
হুনিয়া চায়া ক্যানে ভাতার ধরে নাই ?
সেন্দুর সীতে দিয়া ক্যানে আইসে নাই ?

(২১)

ফুরন চিতাইতে কি কি শাস্তুর নাগে ?
আরো তো নাগে মাওরে কাজলের ফোটা ।
আরো তো নাগে মাওরে সেন্দুরের ফোটা
ফুরন চিতাইতে কি কি শাস্তর নাগে ?

(২২)

ঘেরো ঘেরো হে কইতর
ঘেরো বাবা মাড়োয়ার তলে ।
মাড়োয়ার তলে উপজিন ছাওয়া
মাও বাপ বুনিয়া ডাকে ।
আহারে কম বন্ধ ছাওয়া
মাও বা পাইলেন কোটাইরে ? [২১]

মৃত্যুকেন্দ্রিক গান ।

প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলের বৃহত্তর এক জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে গানগুলি হয় তাকে শ্মশান যাত্রার কীর্তন বলা হয় । এধরণের কীর্তন গান শুধু অবস্থাপন্ন রাজবংশী পরিবারের কোন অতিবৃদ্ধ নর নারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয় বলে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন [২২] তা বর্তমান সময়ে উত্তর-বঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশী সমাজের জন্য একথা মনে হয় হয় বলা চলে না । কারণ উত্তরবঙ্গের ও গোয়ালপাড়া জেলার আচার ব্যবহার খাদ্য গৃহনির্মাণ কথাভাষা, লোক বিশ্বাস, লোকসাহিত্যের মধ্যে গভীর নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে দুটি অঞ্চলের পার্থক্য বশতঃ কতগুলো রীতির ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । একারণে গোয়ালপাড়া জেলার একজন গরীব রাজবংশী সমাজের মানুষের মৃত্যু হলেও গ্রামের বা পাড়ার লোকেরা শ্মশানযাত্রায় কীর্তন গানে অংশ গ্রহণ করে । তাছাড়া আরও একটি দিক রয়েছে তা হোল উত্তরবঙ্গে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুতভাবে অধিকাংশ সম্পন্ন রাজবংশী একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে ছোট ও ভূমিহীন পরিবারে পরিণত হওয়ায় সমাজের মধ্যে সংহতিও বিপন্ন হয়ে পড়েছে গরীবের শ্মশানযাত্রায় কীর্তন না থাকার এটিও একটি কারণ হতে পারে । পক্ষান্তরে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় আনুপাতিক হারে উত্তরবঙ্গের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি । সমাজের ভূস্বামী বা গীতির প্রথা এখনও দোর্দন্ডপ্রতাপে চলেছে । তাই পুরণো সামাজিক রীতিনীতি প্রথাপ্রকরণ মূল্যবোধ প্রায় অটুট রয়েছে ; যেকারণে এতদঞ্চলে একজন গরীব বয়োবৃদ্ধ গ্রামবাসীর মৃত্যু হলেও শ্মশানযাত্রায় স্বাভাবিকভাবেই সমাজের দশজন এসে কীর্তনে অংশ গ্রহণ করে ।

শ্মশান যাত্রার সময় শববাহকেরা একজন প্রথমে উচ্চারণ করবে হরি হরি বলো, বাকিরা উত্তরে বলবে 'বোল হরি' । কিন্তু ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেছেন, NOT BOLOHARI AS IN THE CASE OF SOUTH BENGALI HINDUS. [২৩]
মৃত্যু মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে গঙ্গাজল দেয়া হয় । গঙ্গাজল না থাকলে পরিষ্কার পানীয় জলে তুলশীপাতা ভিজিয়ে মুখে দেয়া হয় । মৃত্যুর পর শবদেহকে তুলশীমঞ্চের সামনে এনে উত্তর মুখে মাথা রেখে শুইয়ে দেয়া হয় । মৃতদেহকে শ্মশান যাত্রার জন্য যখন বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসা হয় তখন বাড়ীর একজন মহিলা একটি ঘটি বা কলসে গোবরজল সহ একটি ঝাটা হাতে করে শবযাত্রীদের পিছনে পিছনে বাড়ীর বাইরে

কিছুদূর অনুসরণ করে। সেসময় মহিলাটি শবযাত্রীদের পিছনে মাটিতে গোবরজল ছিটিয়ে দেয় ও ঝাঁটা দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দেয়। শবযাত্রীরা দূরে চলে গেলে মহিলাটি বাড়ীতে ফিরে আসার পথে ঘটি বা কলসটি ভেঙে ফেলে দেয় সেসময় অন্য আর একজন মহিলা তার মাথায় এক লোটা জল ঢেলে দেয়। অতঃপর তারা দুজনেই বাড়ীতে ফিরে আসে। এইভাবে ঘটি বা কলসভাঙাকে জলপাইগুড়ির গ্রামীন সমাজে রাজবংশীদের মধ্যে 'দুঃখের ডোকা ভাঙা' বলে।

এবারে মৃত্যুকেন্দ্রিক কীর্তন গানের[২৪] কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হোল। গানগুলির অধিকাংশই বাংলা। কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার মিশ্রণ নেই বললেই চলে।

তুলশীতলা থেকে মৃতদেহকে সৎকারের জন্য নিয়ে যাবার সময় শববাহকেরা যখন কাঁধে তুলতে থাকে সেসময়ের জন্য নির্দিষ্ট কীর্তন গান এই ধরণের ::

১

জয় রাধে গোবিন্দ হরি, হরি হরি বোলরে
ওরে দিনে দিন বয়ে যায় পারের উপায় কি ?
তার নাই ভাবনা।
যেদিন উঠিবে কাসি লাগিবে দীর্ঘ শ্বাসি
সেদিন প্রতিবেশী বলিবে আসি
ঘরের বাহির করে দেনা
জয় রাধে গোবিন্দ হরি, হরি হরি বোলরে।
যেদিন দেহের জল টুটিবে, সেদিন বল টুটিবে
সেদিন মধুমাখা এই হরির নাম
বলতে মুখে বল পাবিনা।

২

<u>এর পর শ্মশান যাত্রার কীর্তন :</u>

সুরধনীর তীরে হরিবোল বইলে যায় যাবে প্রাণ
যায় যাবে প্রাণ গৌরাঙ্গ আমার যায় যাবে প্রাণ।
সুরধনীর তীরে হরিবোল বইলে।
রোগ হইয়াছে কলিরাজা ঔষধ হরির নাম।

আরো কি ভরসা করবে মন ভবে আসিবার
সুরধুনীর তীরে হরিবোল বইলে ।

৩

পিছুপানে চেয়ে দেখ
হায়রে শমন দাড়াইয়েছে ।
শমন কিং করে বেঁধে লবে করে করে
কে বা তোর যাইবে সাথেরে ।
ও মন কেবা তোর যাইবে সাথেরে ।
একবার হরিবোল হরিবোল ।
নাম যাবে আর প্রাণও যাবে হরিবোল হরিবোল ।
পেয়ে কামিনীর কোল না বলিলি হরিবোল
বৃথা কাজে কাটাইলি কালরে
ওমন বৃথা কাজে কাটাইলি কালরে ।

৪

ভুবন মঙ্গল গাওরে হরির নাম
যে জন মুখে বলে হরি হরি
তার ঘাটে বান্দা নামের তরী
গাওরে হরির নাম ।
ভুবন মঙ্গল গাওরে হরির নাম ।
আজি শুনিনাম সাধুর মুখে
জীবের গতি নাই গোবিন্দ বিনে ।
মানব জীবের গতি নাই গোবিন্দ বিনে ।
ভুবন মঙ্গল গাওরে হরির নাম ।
এ নাম ভার নারে বোঝা নারে
শুধুই মুখের কথাতে কেবল গাওরে হরির নাম ।
ভুবন মঙ্গল গাওরে হরির নাম ।

৫

শ্রাদ্ধের দিনের কীর্তন

ওরে মিছে পরের জন্য প্রাণ কান্দে
বল রাধে গোবিন্দ, বল রাধে গোবিন্দ ।
ও হরির নামের প্রভাবে স্বভাব যাবে দূরে
(ও দেহে) রবেনা দেহের কামের গন্ধ
বল রাধে গোবিন্দ, বল রাধে গোবিন্দ ।
শ্রীগুরু কান্ডারী করো নামেতে ডাংকা মারো,
পার হয়ে যাবিরে তুই ভবতরঙ্গ এ ভব সাগরে ।
আমার আমার ছারো সাধুর সঙ্গ ধরো
উথলিয়া উঠিবে প্রেমের তরঙ্গ
জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ ।

৬

ভজন কীর্তন

ভজ মন আনন্দে গৌরাঙ্গ ।
যদি তরিতে বাসনা থাকে ধরো রে সাধুর সঙ্গ ।
সাধুর গুণ কি যায়রে ভোলা,
সাধুর চিত্ত শুদ্ধ অন্তর খোলা ।
সাধুর দর্শনে যায় মনের ময়লা
পর্শনে হয় প্রেম আনন্দ
ভজ মন আনন্দে গৌরাঙ্গ ।
এক রসেতে প্রতিবাদী আর এক রসে বহে নদী
আর এক রসে নৃত্য করে নিত্য রসের গৌরাঙ্গ
তারা রসে বশে নৃত্য করে নিত্য রসের গৌরাঙ্গ ।

প্রমাণপঞ্জী অষ্টম অধ্যায় । লোকসঙ্গীত

১। সপ্তর্ষি লোকসাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২ উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে উদ্ধৃত কুশান গান অধ্যায় — রমেন্দ্রনাথ অধিকারী ।

২। এই অংশটি (গালাগানের) ধুবড়ী মহকুমার আপমনি অঞ্চলের শ্রীকামিনী রায় কর্তৃক সংগৃহীত ।

৩। মনকরী আর দুর্গাবরী মনসা কাব্য (১ম খণ্ড) সম্পাদক শ্রীবিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্মা ।

৪। VILLAGE GODS OF SOUTH INDIA, P. 29-30 by. WHITE HEAD

৫। গানের অংশটি সংগ্রহ করেছেন গোয়ালপাড়া জেলার ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারের বাসিন্দা সত্যমনি দাস ।

৬। কোচবিহারের ইতিহাস — খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা ।

৭। রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বন- পৃঃ ১৩০ ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়

৮। বাংলার ব্রত - পৃঃ ১৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৯। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ৪র্থ খণ্ড - পৃঃ ১৮৭৫ — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ।

১০। চাপর অঞ্চলের আব্দুল শেখ-এর সংগৃহীত ।

১১। RAJBANSIS OF NORTH BENGAL P. 222. by. C.C. SANYAL.

১২। L.S.I. VOL V PART I by G.A. GRIERSON.

১৩। বাউদিয়া রায়, বার্শিশ, আলিপুরদুয়ার কর্তৃক সংগৃহীত

১৪। উত্তর বাংলার পল্লীগীতি — ভাওয়াইয়া খণ্ড - সংকলক শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল ।

১৫। লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম পৃঃ ১৫৫ — হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৬। বিশ্বভারতী পত্রিকা — বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৪

১৭। উত্তর বাংলার পল্লীগীতি - ভাওয়াইয়া খণ্ড — ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী রচিত ভূমিকা ।

১৮। বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খন্ড - পৃঃ ২২১ ।

১৯। বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড - পৃঃ ৬২

২০। মেহ্নিপুরের গানগুলির সংগ্রাহক বটকৃষ্ণ রায়, এম.এ.বি.টি., মুসলমানী গানের সংগ্রাহক - আনোয়ার হোসেন, গোয়ালপাড়া জেলার সংগ্রাহক ধীরেন দাস এম.এ. ও কোচবিহারের সঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন শ্রীমতী সরলা দেবী ।

২১। গোয়ালপাড়া জেলার বিয়ের গানগুলির সংগ্রাহক জয়তী চক্রবর্তী, ধীরেন দাস। মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিয়ের গানগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর অঞ্চলের জজন হুসেন ও মোজাহার আলী প্রধানী । কোচবিহার জেলার বিয়ের গানটি শ্রীমতী সরলাদেবী (অধিকারী) ও দার্জিলিং জেলার গানগুলি প্রভা সিং ও সুবল সিং ।

২২। THE RAJBANSIS OF NORTH BENGAL Chapt V P118 by C.C.SANYAL

২৩। Do.

২৪। মৃত্যুকেন্দ্রিক সবগুলি গানই সংগ্রহ করে দিয়েছেন গৌরীপুর নিবাসী শ্রীমহেন্দ্র রায় ।